সত্যের ডাক

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

বিসমিল্ল্যাহির রহমাানির রহীম

লেখকের আবেদন

সকল প্রশংসা এক মাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম শান্তির দূত মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার, সাহাবা কেরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের উত্তম অনুসারীদের প্রতি বর্ষিত হোক।

সত্য তালাশ ও তা গ্রহণ করা প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তির কাজ। আপনি সত্যের সন্ধানে পা বাড়ালে সে পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সৃষ্টিকর্তার। সালমান ফার্সী [رضي الله عنه] একজন অগ্নিপূজক ছিলেন। তিনি সত্যের সন্ধানে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, মাতৃভূমি সবকিছু ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনে নেমে আসে কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু পরিশেষে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা সত্য পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য তাঁকে বয়স দান করেন ২৫০ বছর।

অতএব, আপনার করণীয় হচ্ছে সত্যের সন্ধান করা আর সত্য পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজ আল্লাহ তা'আলার।

আসুন! আর দেরী না করে আজই সত্যকে জানা ও গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করুন এবং ইহকাল ও পরকালের শান্তি অর্জন করুন।

যাঁরাই এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং যে সকল লেখকের বই-পুস্তক দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করেছি তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বইটির দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর

হলে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে। ইন শাাআল্লাাহ তা'য়ালা।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব
প্রথম: ২০/০৭/১৪২৫হি:
দ্বিতীয়:১৯/০৩/১৪৩৪হি:

ভূমিকা

আমরা চিন্তা করি, কারও সামনে কেউ যদি বিষকে ঔষধ মনে করে বাঁচার লোভে পান করতে যায়, তবে তাকে সেই বিষ পান করা থেকে বিরত রাখা জরুরি। ইহা বিষকে বিষ বলে জানা লোকদের জন্য একটা বিরাট নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি বরং তার চাইতেও অনেক গুণ বেশি দায়িত্ব এসে পড়ে তাদের উপর যারা স্পষ্টভাবে বুঝেন যে, কিছু লোক ধর্মীয় অজ্ঞতার কারণে পরকালের মুক্তির আশায় ভুল করে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

তাদেরকে ঐ আগুনের পথ থেকে ফেরানো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটা যে কত বড় দায়িত্ব তা মানুষ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারত যদি মৃত্যুর পরের ঘটনাগুলিকে আল্লাহ তা'আলা এই জীবনে দেখার কোন ব্যবস্থা করে দিতেন। কিন্তু যদিও আল্লাহ তা'আলা চর্মচক্ষে তা দেখার কোন ব্যবস্থা করেননি, তবে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা

দেখার ব্যবস্থা করেছেন। জ্ঞানের চোখ দিয়ে তা কিছু লোক দেখেও থাকেন।

আমরা চিন্তা করি, একটা লোককে আগুনে পুড়তে দেখেও যারা তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে না তারা যেমন চরম নিষ্ঠুর, নির্দয় ও পাষাণ। তেমনি আমরা চরম নিষ্ঠুর ও নির্দয় হিসেবে আল্লাহর দরবারে চিহ্নিত হব, যদি মানুষদেরকে আগুনের দিকে ছুটে যেতে দেখেও তাদেরকে ফেরানোর জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা না করি।

এই অনুভূতিই আমাদেরকে পীড়া দেয়। তাই আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের জ্ঞান মোতাবেক কিছু তথ্য এখানে পেশ করা হলো, যাতে করে সত্য পথের অনুসন্ধানীগণ গ্রহণ করে। আর ইহলৌকিক ও পরলৌকিক শান্তি অর্জন করতে পারেন।

আসুন! আর সত্যকে চেঁপে না রেখে বিবেক দিয়ে তা বুঝে গ্রহণ করি এবং দুনিয়ার পরম শান্তি ও পরকালের নরক থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করি।

আল্লাহর অস্তিত্ব

আল্লাহকে অস্বীকার করার পিছনে নাস্তিকদের প্রধান যুক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

১. যা দেখিনা তা মানি না।
২. যা পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না তা বিশ্বাস করি না।
৩. আল্লাহকে মানলে তার দেয়া ধর্মকে মানতে হবে, যার অনেক কিছুই অবৈজ্ঞানিক।
৪. যতদিন জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভবপর হয়নি ততদিন মানুষ অসহায় মনকে বুঝ দেয়ার জন্য অগত্যা এক কল্পিত খোদাকে মেনেছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে আর তা মানার কোন প্রয়োজন নেই।

আচ্ছা যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যদি তাই হয়, তাহলে এ বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা কে? এর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক কে? হয়তো তারা বলবেনঃ

১. এ সকল আকর্ষিকভাবে সৃষ্ট হয়েছে।
২. বা সকলে নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করেছে।

৩. বা প্রাকৃতিক ভাবেই সবকিছু চলছে। এর কোন পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক নেই।

আমাদের বিশ্বাস তারা বাস্তব ও যুক্তিকে শ্রদ্ধাভরে সাদরে গ্রহণ করবেন এবং এর বিপরীত হলে প্রত্যাখ্যান করবেন।

তাহলে আসুন! তাদের যুক্তি ও থিওরীগুলো বাস্তবতা ও যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যাক।

প্রথম যুক্তির খণ্ডন:

যার অস্তিত্ব আছে তার সবই কি চোখ দ্বারা দেখেন? এখন এই জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের চরম উন্নতির যুগে এটা কোন যুক্তিই নয় যে, যা বিশ্বাস করি তার সবকিছুই চোখ দ্বারা দেখা লাগবে। প্রকৃতপক্ষে অনেক কিছুই না দেখেও তো বিশ্বাস করেন। যেমন:

১. বাতাস দেখেন কি? তা গায়ে অনুভব করেই তো বিশ্বাস করেন?

২. অক্সিজেন না দেখেও তার গুণাগুণ উপলব্ধি করে বিশ্বাস করেন।

৩. মধ্যাকর্ষণ শক্তি দেখেন কি? তার পরেও বিশ্বাস করেন।
৪. বেতারে কথা শুনে এবং টিভি দেখে ইথারকে বিশ্বাস করেন।
৫. চোখ দিয়ে না দেখেও কাজ দেখে বৈদ্যুতিক শক্তিকে বিশ্বাস করেন।
৬. চেখের সাহায্যে দেখে দৃষ্টি শক্তিকে না দেখেই বিশ্বাস করেন।
৭. কান দিয়ে শুনে শ্রবণ শক্তিকে না দেখেই বিশ্বাস করেন।

এভাবে হাজারও জিনিসের কাজ দেখে তার সত্তা ও শক্তিকে বিশ্বাস করি। কাজেই্ এসব বিশ্বাস যখন করতে পারি তখন কি শুধু আল্লাহকেই তাঁর কাজ দেখে বিশ্বাস করা যাবে না? তাঁকে কি দেখাই লাগবে? অথচ তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জগতই তাঁর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে।

আমরা আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করি তাঁর নবী-রসূলগণের সাক্ষ্য থেকে। এ বিশ্বাস কি আমাদের জন্যে অযৌক্তিক? যদি তাই হয়, তবে:

১. একজন বিচারক সাক্ষীর কথা শুনে না দেখেও একজন মানুষকে ফাঁসি দেন কি করে?
২. একজন সন্তান তার বাবাকে না দেখেও মায়ের সাক্ষ্যতে কি করে তার বাবা কে তা বিশ্বাস করে।
৩. একজনের সাক্ষ্য দ্বারা পৃথিবীর ভৌগলিক বিশেষ বিশেষ স্থানগুলো চোখে না দেখেও কিভাবে বিশ্বাস করেন?

এসব যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে বিশ্বাস করতে পারেন তাহলে নবী-রসূলগণের সাক্ষ্য থেকে আল্লাহকে কি বিশ্বাস করা যাবে না? এখানে নিরপেক্ষ বিবেক কি বলে? বিবেক বিশ্বাসই করতে বলে। এরপরেও যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তাহলে হয় সে তার বিবেকের সঙ্গে দারুণভাবে দুশমনি করে অথবা নিরপেক্ষ বিবেক তার মধ্যে অনুপস্থিত ধরে নিতে হবে।

দ্বিতীয় যুক্তির খণ্ডন:

যাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে তারই কি অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করেন? আর পঞ্চইন্দ্রিয়ের বাইরের জ্ঞানকে কি নাস্তিকগণ অস্বীকার করেন? যদি তাই হয় তাহলে:

১. সূর্য যে পৃথিবীর চাইতে ১৩ লক্ষ গুণ বড়, তা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে বিশ্বাস করেন?
২. চাঁদে বায়ু নেই। তাই সেখানে যেতে হলে কৃত্রিম অক্সিজেন নিয়ে যেতে হবে। ইহা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরা পড়েছে?

এর দ্বারা প্রমণিত হলো যে, পঞ্চইন্দ্রিয় ছাড়াও জ্ঞানের একটা পৃথক অবস্থান আছে যার দ্বারা মানুষ বহু জিনিস বিশ্বাস করে। কাজেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়া আল্লাহকে বিশ্বাস করা যাবে না এটা কোন যুক্তিই নয়।

তৃতীয় যুক্তির খণ্ডন:

হাঁ কোন কোন ধর্মে র্ধমের নামে ব্যবসাকারীদের কথাবার্তা অবৈজ্ঞানিক হতে পারে। যেমনঃ হিন্দু ধর্মে আছে ইন্দ্র দেবরাজের তৈরী গরুর গাড়িতে করে সূর্য মামা পূর্ব গগন থেকে পশ্চিম গগনে গমন করেন। পশ্চিম সমুদ্রে ডুব দেন সেখান থেকে শুধা পান করে পূর্ব গগনে গমন করেন। এটা অবশ্যই যুক্তি বিরোধী।

ঠিক অনুরূপ খ্রীষ্টানদের ধর্ম যাজকগণ এক সময় প্রচার করেছেন যে, কেউ এক গালে চড় মারলে তাকে

অন্য গাল এগিয়ে দাও। নি:সন্দেহে ইহা বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের কথা।

প্রকৃতপক্ষে যারা গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে সত্যকে মানতে পারেনি তারা জনগণকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মনগড়া ধর্ম তৈরী করে ধর্ম ব্যবসায়ী সেজে সাধারণ মানুষের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে লুটেছে। আর তাদেরকে সত্য দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রেখেছে।

পীর-সুফী দরবেশ ও বুজুর্গ সেজে ধর্মের নামে ব্যবসায়ী কিছু লোক ইহুদী-খ্রীষ্টান, হিন্দু-বৈদ্ধ ও মুসলমান সব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই রয়েছে। আর ধর্মের নামে ব্যবসায় লাগে না, কোন পুঁজি, লাইসেন্স, টেক্স এবং নাই কোন প্রকার নোকসান ও চাঁদাবাজদের সমস্যা। তাদের ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপটাই নাস্তিকদের চোখে ধরা পড়ল অথচ আজ পর্যন্ত কেউ চির বিজ্ঞানময় কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের কোন থিওরী বিজ্ঞান বিরোধী প্রমাণ করতে পারেনি। বরং বিভিন্ন সময় বহু বিজ্ঞানীদের থিওরী ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

যদি নাস্তিক ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে এ বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা কে? এর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক কে? হয়তো তারা বলবেন:

১. এ সকল আকর্ষিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে।
২. বা সকলে নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করছে।
৩. বা প্রাকৃতিক ভাবেই সবকিছু চলছে এর কোন পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক নেই।

প্রথম থিওরীর উত্তর:

এ কথাগুলো যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরোধী তা পরবর্তী আলোচনা থেকে আসুন বুঝার চেষ্টা করি।
বিজ্ঞানীদের ধারণা: এ পৃথিবী এক আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল। অর্থাৎ সূর্যের পাশ দিয়ে এক শক্তিশালী নক্ষত্র দ্রুত বেগে ছুটে যাওয়ার ফলে সূর্যের কিছু দুর্বল অংশ খসে পড়ায় এ পৃথিবীর সৃষ্টি।

আচ্ছা একটু ভেবে দেখুন! ৫/৬ কোটি বছর পূর্বে এরূপ ঘটনা মাত্র একবারই ঘটলো? যে কোন এ্যাক্সিডেন্ট একবার ঘটেই শেষ হয় কি? না বারংবার তা ঘটে। এ কি কোন পরিকল্পিত এ্যাক্সিডেন্ট ছিল? যা

একবারই মাত্র ঘটবে। আর এরপরে শত শত কোটি বছর ধরে আর ঘটবে না?

যদি এ ধরণের কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে, তবে সেই পরিকল্পনাকারীকেই সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার না করার আর কোন যুক্তি থাকে না।

আর যদি বলা হয় ইহা অপরিকল্পিত, তাহলে পুনঃ প্রশ্ন জাগে, তাহলে এ ধরণের এ্যাক্সিডেন্ট কেউ আর দেখেছে বা পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোন নজির আছে?

এসব প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীদের চুপ থাকা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

এ পৃথিবীতে আমরা দেখি যাই দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয় তাই ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। আর আমরা দেখি যে, যাই ব্যবহারযোগ্য তাই সুপরিকল্পিত সৃষ্টি।

সুতরাং, প্রত্যেকটি ব্যবহারযোগ্য জিনিসই পরিকল্পিত সৃষ্টি। আর পৃথিবী যেহেতু ব্যবহারযোগ্য তাই পৃথিবীও পরিকল্পিত সৃষ্টি। এই পরিকল্পনাটা যাঁর তিনিই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় থিওরীর উত্তরঃ

মহাশূন্যের মধ্যে বিজ্ঞানীদের তৈরী স্কাইল্যাব যা কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরী করা হয়েছিল। যার মধ্যে হাজারও প্রকার বৈজ্ঞানিক নিখুঁত নির্ভুল যন্ত্রপাতি ফিট করা ছিল এবং তা (স্কাইল্যাব) রাখা হয়েছিল পৃথিবীর থেকে এক বিজ্ঞানসম্মত দূরত্বে। কিন্তু হাজারও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও তা টিকতে পারল না, কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে ছিটকে পড়ল।

যদি বিজ্ঞানীদের সৃষ্টি স্কাইল্যাবের অবস্থা এরূপ হয়, তবে ৫০০কোটি বছর মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহগুলি কি করে কোন মহা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞচিত ব্যবস্থাপনা ছাড়াই নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেল? এ ছাড়া কোন পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক ব্যতীত আজ পর্যন্ত একবারও তার কিছুই ধ্বংস হলো না? বরং সবকিছুই নির্ভুল পন্থায় চলছে। সূর্য ২৪ ঘন্টায়, চন্দ্র ২৫ ঘন্টায় ও তারকা ২৩ ঘন্টা ২৬ মিনিটে একবার পৃথিবীকে আবর্তন করে আসছে।

একবার চিন্তা করুন যদি এর পিছনে কোন সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রন ও সুবিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনা কর্যকর

না থাকত, তবে স্কাইল্যাবের ন্যায় চাঁদটা যদি পৃথিবীর উপর ছিটকে পড়ত তাহলে পৃথিবীর অবস্থাটা কি হতো?

আপনার যমুনা পাড়ের বিবেকবান একজন বন্ধু এসে বলল, আর জানিস এক অলৌকিক আশ্চর্যজনক ঘটনা:

আমি এক দিন যমুনা নদী পার হওয়ার জন্য পাড়ে এমন সময় পৌঁছলাম যখন কোন স্টীমার বা নৌকা কোন কিছুই নেই। চরম বিপদে পড়লাম চিন্তা করছি কি করে পার হওয়া যায়? সে সময় যমুনা তার ভরা যৌবনে। ঠিক এমতাবস্থায় দেখি, নদীর পাড়ে একটি সেগুন গাছ জন্মিল এবং সাথে সাথে বিশাল একটি গাছ হয়ে গেল। আর নিজে নিজেই চিরে তখতা হয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটি সুন্দর নৌকা তৈরী হয়ে আমার নিকটে আসল। আর মাঝি ছাড়াই আমাকে নদী পার করে দিল।

আচ্ছা বলুন তো! আপনার এ বিবেকবান বন্ধুর এ ঘটনাটি আপনার বিশ্বাস যোগ্য হতে পারে? না কখনো না। কারণ এ ধরণের অবাস্তব কথা বিশ্বাস যোগ্য হতে

পারে না। কোন জিনিস তৈরী হতে হলে এর পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তা প্রয়োজন, একজন পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক থাকা একান্ত জরুরি।

যদি একটি ছোট্ট নৌকা নিজে নিজেই তৈরী হওয়া অসম্ভব হয়, তাহলে কি করে এ বিশ্বজাহান বিনা কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই তৈরী হতে পারে? না না না না না না না না না হতে পারে না।

আর সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা বিবেক বিরোধী ও যুক্তিহীনতার বহি:প্রকাশ ছাড়া আর কি হতে পারে?

সুতরাং প্রমাণিত হলো: আকস্মিক বা নিজে নিজেই কিংবা কোন পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক ব্যতীত কিছুই হওয়া সম্ভবপর নয়। বরং অবশ্যই যে কোন সৃষ্টির জন্য একজন সৃষ্টিকর্তা, মহা নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপক রয়েছেন যিনি সবকিছুর সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রন ও পরিচলনা করছেন।

এবার তাহলে আসুন! আমাদের জানা প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তার পরিচয়। তিনি কে? কি তার ক্ষমতা? কেন তিনি বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন? সৃষ্টির নিকট তিনি কি চান?

সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন

পূর্বে আমরা একমত হয়েছি যে, এ বিশ্ব চরাচরে যতকিছু রয়েছে কেউ নিজে নিজেই সৃষ্টি হয় নাই। বরং সবার সৃষ্টিকর্তা আছেন। তবে সৃষ্টিকর্তা কতজন একক না একাধিক? যদি ধরে নেই একাধিক, তাহলে পৃথিবী অচল হয়ে পড়বে। কারণ, মনে করুন একজন মানুষের দু'জন মালিক। দু'জনের চাহিদা কখনো একই হতে পারে না। একজন হয়তো বলবেন, এ কাজটি কর ও অপরজন বলবেন, অমুক কাজটি কর। একজন বলবেন, বাজারে যাও আর অপরজন বলেবেন, জমি চাষ করতে যাও। এমতাবস্থায় ঐ লোকটির অবস্থা কি হবে বলেন তো? একই সাথে তার জন্য দু'জন মালিকের নিয়ম-নীতি মেনে চলা কোন ভাবেই সম্ভবপর না। কারণ, একজন খুশি হলে অপরজন নারাজ হবেন। দু'জনের সন্তুষ্টি একসাথে অর্জন করা অসম্ভব।

ঠিক অনুরূপ একাধিক সৃষ্টিকর্তা হলে প্রত্যেকেই চাইবেন যার যার ইচ্ছা মত পৃথিবী পরিচালনা ও

নিয়ন্ত্রণ করতে। যেমন: একজন বলবেন বৃষ্টি হও অপরজন বলবেন বৃষ্টির প্রয়োজন নেই। একজন বলবেন রাত হও এবং অপরজন বলবেন দিন হও। একজন চাইবেন শীতকাল, অপরজন চাইবেন গ্রীষ্মকাল। যার ফলে সৃষ্টিকর্তাদের মাঝে আপোসে ঝগড়া-ফাসাদ হবে এবং এ পৃথিবী অচল হয়ে পড়বে।

আর যদি বলেন, আসমান-জমিন ও এ দু'য়ের মাঝে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক মাত্র একজন। তাহলে সবকিছুই একজনেরই নিয়ম-নীতিতে চলবে আর ইহাই বাস্তবধর্মী। কারণ, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন বিশৃঙ্খলা ছাড়াই একই নিয়মে চলে আসছে।

সুতরাং বাস্তবতা, বিবেক ও যুক্তির কষ্টিপাথরে ইহাই প্রমাণিত হলো যে, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক ও নিয়ন্ত্রক মাত্র একজন, একাধিক নয়।

সৃষ্টিকর্তার পরিচয়

এবার তাহলে আসুন সৃষ্টিকর্তা কে তাঁর পরিচয় জানা যাক। একজন মানুষকে যদি বলা হয় তোমার বাবা কে? আর যদি সে উত্তরে বলে, জানি না তাহলে সমাজ তাকে কি বলবে? নিশ্চয়ই বলবে, তোমার মত অজ্ঞ আর কেউ নেই। তুমি তোমার বাবার পরিচয় জানো না! সকলে তাকে ধিক্কার দিবে। বরং কেউ কেউ অপবাদও দিতে পারে। আর যদি মার পরিচয় দিতে অক্ষম হয়, তবে ব্যাপারটা আরো জটিল নয় কি?

এ কেমন মানুষ যে নিজের মার পরিচয় জানে না! যার পেট হতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং বুকের দুধ পান করেছে তার পরিচয় জানে না?

নিজের বাবা-মার পরিচয় না জানা যদি অজ্ঞতা ও অপরাধ হয়, তবে একজন তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় না জানা কত বড় অপরাধ এবং অজ্ঞতা একবার ভাবুন?

অতএব, প্রত্যেক সৃষ্টি তথা সর্বশ্রেষ্ট জাতি মানুষের জন্য একান্ত জরুরি তার সৃষ্টিকর্তা (খালেক)

ও মাবুদ (উপাস্য)কে জানা, তাঁর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং কেন তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন সে ব্যাপারেও অবগত হওয়া।

সৃষ্টিকর্তা তিনি যিনি আসমান-জমিন ও এ দু'য়ের মাঝে যতকিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন। যিনি চিরঞ্জীব, যিনি সকলকে মায়ের পেটে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি করেন এবং মায়ের বুকে বাচ্চার জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। যিনি দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করেন। যিনি সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু বলেন "হও" আর তা সাথে সাথেই হয়ে যায়।

যিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জমিন থেকে ফসলাদি ফলান, যাঁর হাতে জীবন-মরণ, যিনি রাজাকে প্রজা এবং প্রজাকে রাজা, গরিবকে ধনী ও ধনীকে গরিব বানান। যিনি বিশ্ব জাহানের রাজাধিরাজ, মহা ব্যবস্থাপক ও মহা পরিচালক। যিনি নিজের উপর জুলুম করাকে হারাম করেছেন এবং কারো উপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং সৃষ্ট জীবের আপোসের মধ্যেও জুলুমকে হারাম করে দিয়েছেন।

সমস্ত কল্যাণ ও রুজির চাবি-কাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে। যিনি সকলকে সমানভাবে তাঁর সূর্যের তাপ ও চন্দ্রের আলো এবং আব-হাওয়া দ্বারা লালিত-পালিত করেন। যিনি সপ্তম আকাশে আরশে আযীমের উপর থেকে এ পৃথিবীর সবকিছুই অবোলকন করছেন এবং অবগত আছেন। তাঁর দৃষ্টি, শক্তি ও জ্ঞানকে ফাঁকি দেওয়ার শক্তি কারো নেই। যাঁর কোন সদৃশ নেই, তিনি শুনেন ও দেখেন। যিনি বান্দার সর্বপ্রকার চাহিদা পূরণ করেন। তাদের ডাকে সাড়া দেন। যাঁর ভাণ্ডার কখনো শেষ হয় না। যিনি সকল জীবজন্তুর খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। যাঁকে ফাঁকি দেয়া কোন ভাবেই সম্ভব না। যিনি পৃথিবীর মহা ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

এ ভূ-পৃষ্ঠে একটি ছোট্ট পিঁপড়াও কোন উদ্দেশ্য ছাড়া দৌড়া-দৌড়ী করে না। একটি ছোট্ট বাচ্চাও কাঁদে মায়ের দুধ পান করার জন্য। মানুষ যা কিছু করে তার পিছনে একটা অবশ্যই উদ্দেশ্য থাকে।

এবার প্রশ্ন হলো: সৃষ্টিকর্তা (খালেক) এতো কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি ও ব্যবস্থা করেছেন তিনি তাদের থেকে কি চান? মানুষকে কি উদ্দেশ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন?

নি:সন্দেহে মহান আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এক মহৎ উদ্দেশ্যে। আর তা হলো: তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা এবং একমাত্র তাঁরই এবাদত তথা বন্দেগী ও দাসত্ব করা। যিনি পূর্বে উল্লেখিত শক্তির অধিকারী, মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূরণকারী, তিনিই একমাত্র এবাদত তথা উপাসনার হকদার। তিনিই একমাত্র সত্য ইলাহ তথা উপাস্য। মানুষ যাঁর এবাদত (উপাসনা) ক'রে, শ্রদ্ধা ও সম্মান দ্বারা, দিল উজাড় করে মনের গভীর থেকে

ভালবেসে, ভয়-ভীতি সহকারে, চাওয়া-পাওয়া ও আশা-আকাঙ্খা নিয়ে এবং নিজের সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে। আর এসব গুণের অধিকারী হচ্ছেন যিনি তিনিই ইলাহ তথা মহান আল্লাহ।

কিছু মানুষ বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করেন। যেমন: হিন্দু ভাইরা দূর্গা দেবীর পূজা করেন পরক্ষণে তারে পানিতে ডুবিয়ে দেন। আচ্ছা কি করে ইহা সত্য ইলাহ (উপাস্য) হতে পারে? একটু ভেবে দেখেছেন কী?

আবার কেউ গাভীকে মা মনে করে পূজা করেন কিন্তু সেই গাভীকে রাখে নোংরা গোয়াল ঘরে আর নিজে থাকে সুন্দর বেড রুমে। কি আশ্চর্য কথা যে, যাকে মা তুল্য মনে করেন তাকে রাখেন গোয়াল ঘরে? এই কি মার সম্মান! ইহা কি করে আবার পূজনীয় দেবতা? আবার কেউ কেউ গাভী দ্বারা হাল চাষও করে। এসব মানুষের বিবেক কোথায়? আবার কেউ চন্দ্র-সূর্য, কেউতো মাটি বা পাথরের নির্জীব মূর্তির উপাসনা করেন? আরো আশ্চর্য যে, কেউ শিব লিঙ্গেরও পূজা করে থাকেন!

আবার কিছু নামধারী ভণ্ড মুসলমান মৃত ব্যক্তিদের পূজা করেন, তাদেরকে বিপদের সময় উদ্ধারের জন্য ডাকে, তাদের নিকট চায়, এরচেয়েও কি মূর্খ ও অধম আর কেউ এ দুনিয়ায় আছে?

যারা নিজের ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারে না, যে নিজের উপর থেকে একটি ছোট মাছিকে তাড়াতেও সক্ষম না, সে আবার অন্যের জন্য কি করে উপকার বা অপকার করতে পারে? যাকে মানুষ নিজের হাত দ্বারা বানায় সে আবার কি করে ভগবান হতে পারে? কি করে উপাস্য হতে পারে? সে কি করে উপকার করতে পারে? যে নিজের খবর রাখতে পারে না, সে অন্যের খবর কি করে রাখবে।

যারা নড়ে না চড়ে না, যাদের কান নেই চোখ নেই, নেই কোন উতপাৎ, খায় না কোন দুধ-ভাত, তারই আবার পূজনীয়? তাদের জন্য আবার দুধ কলা আর আতব চাল! হায় আফসোস! শত আফসোস ঠাকুর বা কবর পূজারীদের এক শ্রেণীর মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতার জন্য ধর্মের নামের ব্যবসা আজ পর্যন্ত জমজমাট। বিনা পুঁজির ব্যবসা যার লাগে না

কোন ট্যাক্স আর না লাগে লাইসেন্স এবং যার না আছে কোন প্রকার লোকসান ও চাঁদাবাজদের ঝামেলা।

কিভাবে আল্লাহর এবাদত করব?

যখন কোন বড় ব্যক্তির জন্য কোন কাজ করা হয় তখন তিনি কিভাবে করা পছন্দ করেন ঠিক সে ভাবেই করা কাম্য সকলের। তাই ইশ্বর (আল্লাহ) কিভাবে এবং কি দ্বারা তাঁর এবাদত (পূজা) করা পছন্দ করেন ঠিক সেভাবেই ও তা দ্বারাই তাঁর এবাদত করা একান্তভাবে প্রত্যেকের জানা উচিত।

এখন প্রশ্ন হলোঃ কিভাবে এবং কি দ্বারা তিনি এবাদত (পূজা) করা পছন্দ করেন তা জানার ব্যবস্থা ও উপায় কি? যদি তাঁর নিকট থেকে সরাসরি জানার ব্যবস্থা থাকে তবে খুবই ভাল। কিন্তু যদি তার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে আল্লাহর দূতদের (রসূলগণের) মাধ্যমে জেনে নিতে হবে। শুধুমাত্র রসূলগণের নিকট আল্লাহর ঐশীবাণী আসে।

আমরা যদি আল্লাহর রসূল (দূতের) মাধ্যমে জানার চেষ্টা করি তবে ইহাই পাই যে, আল্লাহ সরাসরি কোন মাধ্যম ছাড়াই একমাত্র তাঁরই এবাদত করতে বলেছেন এবং সর্বপ্রকার মাধ্যম (শিরক) ত্যাগ করতে

বলেছেন। কি কি এবাদত (পূজা) তিনি পছন্দ করেন তাও নির্দিষ্ট করেছেন তাঁর দূতের মাধ্যমে। কাজেই বান্দার ইচ্ছামত কোন এবাদত করলে চলবে না।

আবার সে এবাদতগুলি কিভাবে করতে হবে তারও পদ্ধতি একমাত্র তাঁর রসূলগণের মাধ্যমেই বলে দিয়েছেন। আর সে পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতি করলেও তা কবুল (গ্রহণ) করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল যে, আল্লাহর এবাদত (উপাসনা) সরাসরি কোন মাধ্যম যেমনঃ দেবতা বা ফেরেশ্‌তা কিংবা নবী-রসূল কিংবা ঠাকুর-পীর ছাড়াই ঐ সকল এবাদত এবং তা দূতের দেয়া পদ্ধতিতেই করতে হবে।

মানুষের নিজের ইচ্ছামত কোন বানানো এবাদত বা নতুন আবিস্কৃত কোন পদ্ধিতিতে এবাদত করলে তা কবুল (গ্রহণ) করবেন না। চাই তা যতই ভাল ইচ্ছা নিয়ে ও ভাল পদ্ধতিতে করুক না কেন।

সুতরাং, সকলের একান্ত জানা জরুরি যে, এবাদত কাকে বলে এবং এবাদত কি কি ও তা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি কি?

মানব জীবনে ধর্ম ও আদর্শের প্রয়োজনীয়তা

যদি একজন ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট এম, এস, সি পাশ করা ভদ্রলোক বলেন: আমি কোন সিলেবাস, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান ছাড়াই এ সকল কৃতিত্ব অর্জন করেছি। তাহলে কোন পাগলও তা বিশ্বাস করবে না। কারণ, ভাল সিলেবাস, ভাল শিক্ষক ও ভাল প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ইহা কল্পনাই করা যেতে পারে না।

একজন রোগীর জন্য প্রয়োজন একজন ভাল ডাক্তার এবং ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপশন) বুঝার জন্য প্রয়োজন একজন ভাল ফার্মাসিষ্ট, যিনি ডাক্তার সাহেবের ঐ গুরুত্ব পূর্ণ প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ঔষধ দিবেন এবং সেবনের নিয়ম নীতি রোগীকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

অনুরূপ আল্লাহর এবাদত কি দ্বারা এবং কিভাবে করা প্রয়োজন তা জানার জন্য একটিই মাত্র পন্থা। আর তা হলো: আল্লাহর দেওয়া সর্বশেষ পরিপূর্ণ নির্ভেজাল সিলেবাস (কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের

ইসলাম) ধর্মকে এবং ঐ সিলেবাসকে পড়ানো ও বুঝানোর জন্য সর্বোত্তম, সর্বশেষ মহাগুরু ও শিক্ষক (মুহাম্মাদ সঃ)কে জানা। যাঁকে আল্লাহ তাঁর দূত হিসাবে মানব জাতির নিকট ইসলাম ধর্মকে প্রচার ও প্রসার করার জন্য এবং মানুষকে মানুষের বা অন্য কোন সৃষ্টির এবাদত করা থেকে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। যাঁকে সর্বপ্রকার জুলুম-নীপিড়ন, যেনা-ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, সাদা-কালোর পার্থক্য, ধনী-গরিব ও নারী-পুরুষের ফারাক মিটিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। মেয়ে সন্তানকে হত্যা করা থেকে এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর এ দুনিয়াই আগমণ ঘটেছিল।

সমাজের সর্বপ্রকার অশ্লীলতা, বেহায়াপোনা, নোংরামি, চুরি-ডাকাতী, রাহাজানি, হানাহানী, খুন-খারাবী, ছিনতাই কালবাজারী ইত্যাদি সকল অবৈধ কাজ ও সকল প্রকার অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তাঁকে বিশ্ব বাসীর জন্য রহমত ও উত্তম আদর্শ করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গরিব,

মিসকিন, এতিম, অনাথ, বিধবা ও বিপদগ্রস্তদের পরম বন্ধু। দিশাহারা, পথহারা, অশান্ত প্রিয় জাতিকে পথ দেখাবার জন্যই এ ধরাধামে তাঁকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন। মানব জাতি যখন জাহেলিয়াতের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন এ মহা মানবের প্রয়োজন সকলে অনুভব করতেছিল। আর তাই সৃষ্টির্কতা বিশ্ববাসির জন্য এক শান্তির দূত পাঠান। আর তিনিই হলেন মুহাম্মদ [ﷺ]

মুহাম্মদ (ﷺ) হিন্দু ধর্মগ্রন্থে

(ক) বেদসমূহে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উল্লেখঃ

হিন্দু ধর্মের সর্বাধিক পরিচিত ও সর্বপ্রথম ধর্মীয় গ্রন্থ হলোঃ "বেদ" আর বেদ হলো চারটিঃ ঋক্ বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। বেদ চতুর্বেদে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্যে অথর্ব বেদে বিস্তারিত। এখানে শুধু নমুনা স্বরূপ উক্ত বেদের মন্ত্রের কিছু উপস্থাপনা করা হলোঃ

১. অথর্ব বেদের ২০তম কাণ্ড, নবম অনুবাক একত্রিংশসূক্ত, ৪৭২ পৃষ্ঠার প্রথম মন্ত্রে রয়েছেঃ
"ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে। ষষ্টিং সহস্রানবতিংচ কৌরম আ রুশমেষু দন্মহে"
অর্থ্যাৎঃ হে মানবমণ্ডলী! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর! ''নরাশন্স'' এর প্রশংসা করা হবে। আমি এই মহাজির(দেশত্যাগকারী) বা প্রশান্তির ঝাণ্ডাবাহীকে ৬০ হাজার শত্রুর মাঝে সুরক্ষিত রাখব।

এখানে "নরাশন্স" শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, যা মূলত দু'টি শব্দ মিলে গঠিত। "নর" যার অর্থ হলো মানুষ

আর "আশন্স" যার অর্থ হলো এমন ব্যক্তি যাঁর বেশি বেশি প্রশংসা করা হয়।

সুতরাং "নরাশন্স" এর হুবহু আরবী শব্দ "মুহাম্মাদ"। শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, "নরাশন্স" সংস্কৃত আর "মুহাম্মাদ" আরবী শব্দ।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে "নরাশন্স"কে "কৌরাম" বলা হয়েছে, "কৌরাম" শব্দের দু'টি অর্থ, প্রথম: মহাজির বা জন্মভূমি ত্যাগকারী। দ্বিতীয়: শান্তির ও নিরাপত্তার পতাকাবাহী। এই দু'টি অর্থই আল্লাহর প্রেরীত শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ব্যাপারে সর্বাধিক প্রযোজ্য। কারণ, তিনিই জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন এবং তিনিই শান্তি ও নিরাপত্তার পতাকাবাহী ছিলেন যা ইতিহাস পড়ুয়া যে কোন ছাত্র জানেন।

২. উক্ত বেদের সপ্তম মন্ত্রে রয়েছে:

"রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য যো দেবোহমর্ত্যাঁ অতি। বৈশ্বানরস্য সুষ্ঠুতিমা সুনোতা পরিক্ষিত"

অর্থাৎ: তিনি তো পৃথিবী সম্রাট ও দেবতা, সর্বোত্তম মানুষ, সমস্ত মনবতার দিশারী, সকল জাতির

নিকট সুপরিচিত, তাঁর সর্বোচ্চ প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা কর।

এই মন্ত্রটিও মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বিশেষ কিছু গুণাবলী সংশ্লিষ্ট যা পৃথিবীর কোন মহা পুরুষের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

অথর্ব বেদের ২০তম কাণ্ডের নবম অনুবাক, ৩১তম সুক্তের ১৪ মন্ত্রের ১ম ও সপ্তম মন্ত্র থেকে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হলো। উক্ত বেদের অবশিষ্ট ১২ মন্ত্রে ও ঋক্ বেদে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। জানার জন্য আগ্রহী পাঠককে অথর্ব বেদের ৪৭২ পৃঃ থেকে ৪৭৩ পৃঃ পর্যন্ত পড়ার পরামর্শ রইলো।

উল্লেখিত পৃষ্ঠাসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলোঃ

১. মুহাম্মদ (ﷺ)কে "রবীহ" বলা হয়েছে যার আরবী হুবহু শব্দ "আহমাদ" অর্থাৎ অতি প্রশংসাকারী। যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।
২. তিনি অতি সুদর্শন হবেন। আর ইহা তাঁর জীবন চরিত্রে সবাই উল্লেখ করেছে।

৩. মহাপথ প্রদর্শক, পূত-পবিত্র, বার্তাবাহক, সর্বশ্রেষ্ট মানব এবং পৃথিবীর সরদার ও নেতা হবেন। তাঁর পয়গাম্বারী সমস্ত মানবতার জন্য।
৪. মানুষদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন।
৫. মহান আল্লাহ তাঁকে অদৃশ্যের খবর জানিয়ে দিবেন এবং তিনি তা মানুষদেরকে বলে দিবেন।
৬. তাঁর বাহন হবে উট। আর নিঃসন্দেহে তাঁর বাহন উট ছিল এতে কারো দ্বিমত নেই।
৭. তাঁর ১২জন স্ত্রী হবে। নবী-রসূলগণ, ঋশি ও পুরোহিতদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই ১২জন স্ত্রী ছিল।
৮. তিনি নাস্তিক, জালেম ও পাপীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আর ইহা তাঁর জীবনে ঘটেছেও।
৯. তাঁর সাথীগণ অতি প্রশংসাকারী ও নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী হবেন এমকি যুদ্ধরত অবস্থাতেও। এ নজীর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীগণ ব্যতীত আর কারো মধ্যে পাওয়া যায়নি।
১০. তাঁর সাথীদের দারা-পরিবার যুদ্ধাবস্থায় নিরাপদে থাকবে। ইহা বাস্তবে ঘটেও ছিল।

১১. কাবা ঘর নির্মাণের সময় তাঁর বড় কৌশল প্রকাশ পাবে, যার ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনগণ দারুন আনন্দিত হবে। ইহা তাঁর জীবনে ঘটেছিল যার প্রমাণ ইসলামী ইতিহাস ।

১২. সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করবেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে সকলে খুশি হবেন।

১৩. তিনি অনাথের আশ্রয় স্থল এবং বিধবাদের রক্ষণা বেক্ষণকারী, হাজার হাজার মানুষকে দান-খয়রাত করবেন এবং তাঁর যুগে লোকেরা সবাই শান্তি লাভ করবে।

(খ) পুরাণে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পূর্বাভাসঃ

"পুরাণ" হিন্দু ধর্মের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পুরাণ মোট ১৮টি বলা হয়, তার মধ্যে "ভুশিয়া পুরাণ" অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পুরাণ। পুরাণে "কল্কী অবতার" (বার্তাবাহক) আগমনের পূর্বাভাস স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. কল্কী অবতারের পিতা-মাতার নাম:

কল্কী পুরাণ গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ের **১১**তম শ্লোকে রয়েছে: "সুমতী বিষ্ণুযশাসা গর্ভামা "বিষ্ণুওয়ামু" অর্থাৎ: কল্কী অবতার "সূমতী" এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে আর তার পিতার নাম হবে বিষ্ণুযশা।
''সূমতী'' এর আরবী শব্দ 'আমেনা' আর ''বিষ্ণুযশা'' এর আরবী শব্দ 'আব্দুল্লাহ'। আর বিশ্ববাসী সবাই জানে যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মায়ের নাম ছিল আমেনা আর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। শীমাড্ভাগবতের পুরাণের প্রথম স্কন্ধের ৫পৃষ্ঠায় রয়েছে:"জগৎ পালক শীভগবান কল্কি নাম ধারণ করে বিষ্ণুযশা; নামক ব্রাহ্মণের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হবেন।

২. মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জন্মস্থান ও বংশধর:

শীমাড্ভাগবতের পুরাণের **১**২তম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ের **১**৮তম শ্লোকে এবং কল্কী পুরাণের ২য় অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে শ্রেণীমত ৮০২ পৃষ্ঠায় এসেছে: সেই ভগবান কল্কী শাম্ভল গ্রামের প্রধান বিপ্র মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন।

৩. কল্কী অবতারের আবির্ভাব কালঃ

অথর্ব বেদের ২০তম কাণ্ড নবম অনুবাক ৩১ সুক্তের ২য় মন্ত্রের ৪৭২-৮০৩ পৃষ্ঠায় তার বাহন যে উট হবে তা উল্লেখ হয়েছে। তেমনি কল্কী পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে যে, "কল্কী অবতার ঘোড়া ও উটে আরোহন করবেন এবং তার নিকট তরবারী থাকবে, যার দ্বারা তিনি ধর্মের শত্রুদেরকে ধ্বংশ করবেন। নিঃসন্দেহে এসব মুহাম্মাহ (ﷺ) ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়।

৪. কল্কী অবতারের পিতা-মাতার মৃত্যুঃ

শ্রীমদ্ভগত পুরাণের ১২তম স্কন্ধে বর্ণিত রয়েছে যে, কল্কী অবতারের পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করবেন আর তাঁর জন্মের কিছু কাল পরেই তাঁর মাতাও মৃত্যুবরণ করবেন। আর ইহা চির সত্য যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পিতা তাঁর জন্মের পূর্বে এবং তাঁর মাতা জন্মের ৫/৬ বছর পর মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামী ইতিহাস যার জলন্ত প্রমাণ।

৫. মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে পয়গাম্বরীর সমাপ্তি:

কল্কী অবতারের মাধ্যমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বর ও বার্তাবাহক আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হবে। শ্রীমদ্ভগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ২৫তম শ্লোকে বর্ণিত: "বড় বড় পয়গাম্বর ২৪জন কল্কী অবতার সর্বশেষ পয়গাম্বার হবে, যিনি সমস্ত পয়গাম্বারের পরিসমাপ্তকারী হবেন।

৬. কল্কী অবতার সর্বোত্তম আদর্শ ও বৈশিষ্টের অধিকারী হবেন:

শ্রীমদ্ভগত পুরাণের ১২তম স্কন্ধের ২য় অধ্যায় ৮০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: জগৎপতি যিনি অষ্টস্বর্গিয় গুণে গুণান্বিত হবেন, তিনি একটি উড়াল দেয়া দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহন করে আসবেন এবং জমিনে বিচরণ করে রাজা বেশধারী দস্যুগণকে তিনি তরবারী দ্বারা দমন করবেন। ঐ আটটি গুণের বর্ণনা "মহাভারত" গ্রন্থে এভাবে এসেছে তা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলো:

১. প্রজ্ঞা: অদৃশ্যের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তার খবর দেয়া।

২. কুলীনতা: উচ্চ বংশীয় হওয়া।
৩. ইন্দ্রিয় দমন: স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখার ক্ষমতা।
৪. রশুতিজ্ঞান: আহি (ঐশীবাণী) ও পয়গাম্বারী লাভ।
৫. প্রাক্রম: শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হওয়া।
৬. ভুভাশিতা: মিতভাষী হওয়া।
৭. দান: বদান্যতা।
৮. কৃতজ্ঞতা: কৃতজ্ঞহৃদয়।

উল্লেখিত আটটি স্বর্গীয় মহাৎগুণ হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস মতে কল্কী অবতারের মধ্যে পাওয়া যাবে। যেগুলো নি:সন্দেহে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাথে হুবহু মিলে যায়।
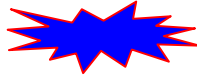
সব ধর্মই কি সঠিক?

যারাই কোন না কোন ধর্ম মানে তারা সকলেই মনে করে তার ধর্মটাই ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, একই ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার বিপরীতমুখী দাবীর সবগুলোই কি ঠিক হতে পারে? একই অংকের একাধিক উত্তরের সবই যেমন ঠিক হতে পারে না, সেরূপ একই সৃষ্টিকর্তার দেওয়া ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার বিপরীতমুখী দাবী বা ধারণার সবগুলোই ঠিক হতে পারে না, এটাই যুক্তিযুক্ত।

এখন প্রশ্ন হলোঃ কার দাবি ঠিক এবং কারটা ঠিক না? এ প্রশ্নের অবশ্যই সঠিক উত্তর আছে তবে তা বুঝতে হলে কমপক্ষে নিম্নের শর্তগুলি মেনে নিতে হবে।

এর জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছেঃ মনকে নিরপেক্ষ ও গোঁড়ামী মুক্ত করতে হবে এবং কোন ধর্ম ঠিক তা বুঝতে হলে বুঝার পূর্বে নিজেকে ধরে নিতে হবে যে আমি কোন ধর্মেরই লোক নই। আমাদের সামনে

অনেকগুলি ধর্ম রয়েছে এগুলি আমরা দেখি, সত্য-মিথ্যা যাচাই করি, এরপর যেটা সঠিক বলে আমাদের জ্ঞানে ধরে সেটাই আমরা গ্রহণ করব। এর জন্য আরও যা প্রয়োজন হবে, তা হচ্ছেঃ

ক. যুক্তি মানতে রাজি থাকতে হবে। অর্থাৎ সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলে মানতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

খ. মানতে হবে ধর্ম কোন পৈত্রিক সম্পদ নয়, এ হচ্ছে ঈমান তথা বিশ্বাসের ব্যাপার।

গ. মানতে হবে বিশ্বাসের সম্পর্ক রক্ত বা বংশের সঙ্গে নয়, এর সম্পর্ক সম্পূর্ণই জ্ঞানের সঙ্গে।

ঘ. মানতে হবে যে, পূর্ব পুরুষের ভুল-বিশ্বাস অকাট্য যুক্তির দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য।

ঙ. মানতে হবে যে, বাপ-দাদার ভুল বিশ্বাস যদি পরিবর্তনযোগ্য নাই হত, তাহলে জ্ঞানচর্চার কোন মূল্যই থাকত না।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, আমাদের দেশে অনেকেরই পিতার বিশ্বাস ছিল পৃথিবী একটা গরুর শিং-এর উপর রয়েছে। সে গরু যখন শিং নড়ায় তখন

ভূমিকম্প হয়। আরও বিশ্বাস ছিল যে, রাহু নামক কোন বিরাট আকারের জন্তু চাঁদকে গ্রাস করত বলে চন্দ্রগ্রহণ হত এবং এটাই ছিল চন্দ্রগ্রহণের কারণ। এরপর দেশের ব্রাহ্মণদের সম্মিলিত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাহু চাঁদকে ছেড়ে দিতো। এ ভাবেই চাঁদের অস্তিত্ব টিকে আছে নইলে বহু পূর্বেই চাঁদ রাহুর পেটে হজম হয়ে যেতো।

পিতার এই সব ভুল বিশ্বাস যদি অকাট্য যুক্তির দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে তাহলে ধর্ম সর্ম্পকীয় বাপ-দাদার ভুল বিশ্বাস কি পরিবর্তন হতে পারে না? অবশ্যই পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাপ-দাদার ভুল বিশ্বাস ত্যাগ করায় যেমন কারও কোন প্রকার অমর্যাদা হয়নি বরং মর্যাদা বেড়েছে ঠিক তেমনই ধর্ম সম্পর্কীয় বাপ-দাদার ভুল-বিশ্বাস ত্যাগ করলেও মর্যাদা কমবে না, বরং বাড়বে।

এসব কথা যারা মানতে প্রস্তুত তাদেরই চোখে ধড়া পড়বে যে, ধর্ম কোনটা ঠিক আর কোনটা বে-ঠিক।

কয়েকটি ব্যাপারে ধর্ম-বিশ্বাসীদের ঐক্যমত

যারা কোন ধর্ম মানে তারা নিম্নের চারটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন। যথা:

১. সৃষ্টিকর্তা আছেন।
২. পরকাল আছে ও বিচার হবে।
৩. বিচারের পর যার যার কর্মফল সে সে ভোগ করবে। সেদিন অপরাধী শাস্তি ভোগ করবে এবং নিরাপরাধ ব্যক্তি মুক্তি পাবে।
৪. পরকালের মুক্তি সবারই কাম্য।

বেশি নয়, এ চারটি বিষয়ে যখন আমরা প্রত্যেক ধর্মের লোকই একমত, তখন আসুন আমরা যার যার নিজের স্বার্থেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে খুব গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি যে, পরকালের মুক্তির সঠিক পথ কোনটি এবং মুক্তির পথ সম্পর্কে কোন ধর্ম কি বলে। আর তার মধ্যে কার কথা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত।

আসুন এগুলো সুস্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখি। দেখুন, রোগ-চিকিৎসার বেলায় যেমন ডাক্তার ও

ঔষধের প্রতি রোগীর আস্থাশীল হতে হয়, ঠিক তেমনই পরকালের মুক্তির ব্যাপারেও একটা পন্থার উপর সম্পূর্ণ নিজেকেই আস্থাশীল হতে হয়। তাই প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির উচিত তার নিজের স্বার্থেই পরকালের মুক্তির সঠিক পথ নিজেই বেছে নেয়া।
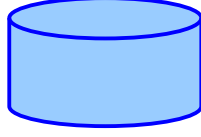
পরকালের মুক্তির পথ একটাই

অনেকের ধারণা নিজ নিজ ধর্ম পালন করলে প্রত্যেক জাতির লোকই পরকালের মুক্তি পাবে। কিন্তু এ ধারণা কি ঠিক? এর সঠিক উত্তর পেতে হলে আপনাকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আল্লাহর নিকট মানুষের পরিচয় কি জাতি হিসাবে, না-কি মানুষ হিসাবেই?

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট মানুষের পরিচয় মানুষ হিসাবেই। লক্ষ্য করলে দেখা যায় আল্লাহর প্রত্যেকটি ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের জন্য একইভাবে কাজ করছে। যেমনঃ দেখুন, খাদ্যের ব্যাপারে প্রত্যেকটি খাদ্য বস্তুই প্রত্যেক জাতির লোকদের জন্য একই প্রকার ফল দেয়। ঠিক তেমনই রোগ চিকিৎসার বেলায়ও প্রত্যেক জাতির লোকের একই রোগের চিকিৎসার জন্য একই ঔষধ প্রয়োজন হয়।

আমরা এরূপ কখনও দেখি না যে, মুসলিমদের ডাইরিয়াতে স্যালাইন, হিন্দুদের ডাইরিয়াতে কুইনাইন, খ্রীষ্টানদের ডাইরিয়াতে এটেভীন,

বৌদ্ধদের ডাইরিয়াতে স্যাফাক্রিন, নাস্তিকদের ডাইরিয়াতে নোভালজীন।

এ ধরণের কোন ব্যবস্থা যেমন পার্থিব জীবনে নেই, ঠিক তেমনই পরকালীন জীবনেও বিভিন্ন জাতির মুক্তির জন্য বিভিন্ন প্রকার কোন ব্যবস্থা নেই।

যে কোন জাতির লোকের একই রোগের যেমন একই ঔষধ প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি পরপারের জন্যও একই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রত্যেকের মুক্তি আসবে এটাই যুক্তিযুক্ত। একই রাষ্ট্রে যেমন এমন কোন আইন থাকতে পারে না যে, কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, আর কেউ চুরি করলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ঠিক তেমনই আল্লাহর আইনও এমন হতে পারে না যে, কেউ দেবতার পূজা করলে তাকে মুক্তি দেওওয়া হবে এবং কেউ তা করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে বা তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

সঠিক যুক্তি হচ্ছে এই যে, একই আল্লাহর আইন তার সৃষ্টি প্রত্যেকটি মানুষের জন্য একই প্রকার হতে হবে। অর্থাৎ পরকালের মুক্তির জন্য নরেস বাবুর জন্য যদি দুর্গা পূজার দরকার হয়, তবে আব্দুল্লাহ সাহেবের

জন্যও তা দরকার হবে এবং দরকার হবে তা পোপ পলের জন্যও।

আর যদি ইসলামি বিধান মেনে চলার প্রয়োজন হয় পরকারের মুক্তির জন্য তবে ইটাই প্রয়োজন হবে প্রত্যেকের জন্য। এটাই যুক্তি এবং এটাই বিবেকের সাক্ষ্য। এছাড়া বিবেক আরও সাক্ষ্য দেয় যে, এড্রিন যেমন সব জাতের মানুষের জনই বিষ, ঠিক তেমনই পরকালের জীবনের জন্য যা বিষ বা যা হবে জাহান্নামের কারণ তা প্রত্যেক জাতির লোকদের জন্যই হবে জাহান্নামের কারণ।

এখন প্রশ্ন হলো: তাহলে মুক্তির সঠিক পথ কোনটি? যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখি যে কোন্ পথটা আল্লাহর দেওয়া। যুক্তিতে যেটাই আল্লাহর দেওয়া সঠিক পথ হিসাবে ধরা পড়বে, আসুন আমরা সেইটাকেই গ্রহণ করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে যাই। কারণ মৃত্যুর হাত থেকে যখন বাঁচার কোন পথ নেই, মরতে যখন হবেই আর মরার পর যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে যেতে হবে এবং সেখানে যেহেতু কোন গোঁড়ামী কাজে লাগবে না। আর যেহেতু সে

জীবনের সুখ-শান্তিও আমরা চাই। তাই যার যার নিজের স্বার্থেই আসুন আমরা সব ধরণের গোঁড়ামী দূর করে নিরপেক্ষভাবে যাচাই বাছাই করে দেখি যে, ধর্ম আসলে কোনটা আল্লাহর দেওয়া আর কোনটা মানুষের তৈরী।
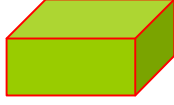
আল্লাহর ধর্ম প্রত্যেকের নিজের ধর্ম

মনে রাখতে হবে আল্লাহর দেওয়া আবহাওয়া যেমন প্রত্যেকের জন্যই ঠিক তেমনই আল্লাহর দেওয়া ধর্ম প্রত্যেকের জন্যই সঠিক। আল্লাহর দেওয়া চাঁদ-সূর্য যেমন কোন গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয়, তেমন আল্লাহর ধর্মও কোন গোষ্ঠী বিশেষের নিজস্ব কিছু নয়।

একই মায়ের দশজন পুত্রের জন্য তাদের মা যেমন কারও একটু বেশি মা এবং কারও একটু কম মা নয়, ঠিক তেমনি ইসলাম যদি আল্লাহর দেওয়া ধর্ম হিসাবে প্রমাণিত হয়, তবে তা (ইসলাম) কারও জন্য কম ও কারও জন্য বেশি অধিকারের হবে না। তা হবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষেরই নিজস্ব ধর্ম। যেমন দশজন সন্তানের মা তার প্রত্যেক সন্তানের সম অধিকারের মা।

অন্যান্য ধর্ম সৃষ্টি হল কিভাবে?

বাবা আদম (আঃ) প্রথম মানুষ। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, সেই বিবেক-বুদ্ধিকে আল্লাহ কিভাবে কাজে লাগাতে চান তা বলে দেয়ার উদ্দেশ্যে তথা মানুষের সঠিক জীবন ব্যবস্থা কি হবে তা বলে দেয়া ও শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ দূত (নবী-রসূল)কে পাঠান।

আর তা পাঠানোর ধারা হলো যখন যে ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তখন সেই ধরণের সমাধান দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ দূত (নবী-রসূল) পাঠিয়েছেন।

এ ভূ-পৃষ্ঠে অনেক নবী-রসূল এসেছিলেন, যাঁদের অনেকের নাম আমাদের জানা নেই। হয়ত হতে পারে যে, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগে তাঁরা নবী-রসূল ছিলেন এবং তাওহীদের প্রচারক ছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁদের ভক্তরা হয়তো পরবর্তী নবীকে গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে মানতে না পেরে, তারা পূর্ব নবীর অনুসারী থাকার নাম করে নিজের মনমত বানানো নতুন ধর্ম সৃষ্টি করে দিয়েছে। যেমনঃ মূসা (আঃ)-এর

কিছু উম্মত গোঁড়ামীর কারণে পরবর্তী নবী ঈসা (আ:) কে মানতে না পেরে তারা ইহুদি জাতিতে পরিণত হয়েছে। ঠিক একই কারণে ঈসা (আ:)-এর উম্মত পরবর্তী ও শেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ (ﷺ)কে মানতে না পেরে খ্রীষ্টান জাতিতে পরিণত হয়েছে।

এভাবেই বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মুসলিম জাতি এমন একটা কথায় বিশ্বাস করি, যা অন্য কোন জাতিই বিশ্বাস করতে পারে না। পারলে তাদের ধর্মও আর টিকে না, তা হচ্ছে এই যে, আমরা সব নবীকেই মানি। আর তা না মানলে আমরা মুসলিম ও মুমিন থাকতে পারি না। কিন্তু অন্য কোন জাতিই সব নবী-রসূলকে মানতে পারে না। আমরা যে সকল নবী-রসূলকে মানতে পারি এবং কিভাবে মানি তা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝার চেষ্টা করি।

যেমন: আমাদের ভারত উপমহাদেশে এমন একদিন ছিল যে দিন বৃটিশ সরকারের রাজত্ব ছিল। তখন আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম বৃটিশ সরকারের নাগরিক। পরে যখন এলো পাকিস্তান সরকার তখন আমরা ছিলাম পাকিস্তান সরকারের নাগরিক। তারপর

এলো বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে আমরা বাংলাদেশ সরকারের নাগরিক।

এখন আমরা প্রত্যেকেই বৃটিশ সরকার ও পাকিস্তান সরকারকে এক কালের সরকার হিসাবে মানি, কিন্তু আইন মেনে চলি বর্তমান সরকারের। এই সরকারের আমলে যদি কেউ দাবি করে যে, আমি বৃটিশ সরকারের আইন মেনে চলব এবং বর্তমান সরকারের আইন মানব না, তাহলে সে ব্যক্তি যে পর্যায়ের অপরাধী হবে ঠিক সেই একই পর্যায়ের অপরাধী হবে তারা যারা বর্তমানে শেষ নবীর আমলের মানুষ হয়ে পূর্ববর্তী নবীর আইন মেনে চলতে চাইবে।

আমরা মুসলিম জাতি অন্যান্য সকল নবীকেই মানি। যেমন এ উপমহাদেশের প্রত্যেকেই বৃটিশ সরকারকে তদানিন্তন আমলের সরকার বলে মানে, ঠিক তেমনই ধর্মের ব্যাপারেও ঐ একই নীতি মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ যদি শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ সত্যই আল্লাহর পাঠান নবী হতেন আর আমরা যদি সেই যুগের মানুষ হতাম, তাহলে তাদের আইন বা শরীয়ত আমাদের মেনে চলতে হত। কিংবা যদি ঈসা (আ:)

বা মূসা (আঃ)-এর যুগের মানুষ হতাম তবে তাঁদের আইন আমাদের মেনে চলতে হত। নইলে অবশ্যই আমাদেরকে নরকবাসী হতে হত। কিন্তু যেহেতু আমাদের জন্ম হয়েছে শেষ নবীর আমলে তাই আমাদের মেনে চলতে হবে শেষ নবীকেই।

এতটুকু সহজ সরল বুঝ যাদের মস্তিষ্কে ঢুকে যাই তারা আর অমুসলিম থাকতে পারে না। যার নজীর শুধু ভারত উপমহাদেশে নয় বরং পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান।

ইসলামই একমাত্র খাঁটি ধর্ম

"ইসলামই একমাত্র খাঁটি ধর্ম" অন্য কথায় সৃষ্টিকর্তার মনোনীত জীবন বিধান। তার স্বপক্ষে অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি সহজ যুক্তি পেশ করা হলোঃ

Ø ধর্মের নামকরণে সার্বজনীনতাঃ

যা খাঁটি ধর্ম তার নামটাও হবে একটা যুক্তিসংগত নাম। লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এ পৃথিবীতে মোট যত ধর্ম আছে তার প্রত্যেকটির নামই সেই ধর্মের প্রবর্তকের বা কোন স্থানের নামানুসারে হয়েছে। যেমনঃ যীশুখ্রীষ্টের নামানুসারে খ্রীষ্টান ধর্ম, মহাবীর জৈনের নামানুসারে জৈনধর্ম, গৌতম বুদ্ধের নামানুসারে বৌদ্ধধর্ম, হেন্দের নামানুসারে হিন্দুধর্ম, কিন্তু ইসলাম ধর্মের নাম কোন ব্যক্তির নামানুসারে নয়।

যদি এ ধর্মের নাম মুহাম্মাদী ধর্ম হত, তাহলে নামকরণের দিক থেকে অন্য ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে

অবশ্যই কোন পার্থক্য থাকতো না। কিন্তু এ (ইসলাম) ধর্মের নাম এমনই একটি সার্বজনীন শব্দ দ্বারা রাখা হয়েছে, যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত। কারণ, মানব জীবনের মৌলিক আকাঙ্খাই হচ্ছে জীবনে শান্তিলাভ করা আর ইসলাম মানেও শান্তি। তাহলে প্রমাণিত হল: মানব জীবনে যে নিয়ম নীতি মেনে চললে জীবনে শান্তি লাভ হতে পারে সেই নিয়ম নীতিই মানব ধর্ম হওয়া উচিত এবং তার নামটাও 'শান্তি ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা' হওয়া যুক্তিযুক্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনের শান্তির জন্যে যেসব নিয়ম-নীতি নবী রসূলগণের মাধ্যমে দান করেছেন সেই সব নিয়ম-নীতির নাম আল্লাহ রেখে দিলেন ইসলাম বা শান্তি। ইসলাম কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং গোটা মানব জাতির ধর্ম। তাই তার নামটা যেমন সর্বজনীন, ধর্মটাও তেমনই সর্বকালীন ও সর্বজনীন।

Ø ধর্মকে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে:

যা আল্লাহর দেওয়া ধর্ম তা অবশ্যই আংশিক জীবন ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়। কারণ, একদিকে আল্লাহকে মানব সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বোচ্চ

ক্ষমতার মালিক হিসেবে, আর অন্য দিকে যদি অন্য কোন সত্তাকে কোন বিশেষ বিষয়ের ব্যবস্থাপক বলে মানতে হয়, তবে প্রকারান্তরে মানা হয় যে, আল্লাহর বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান থাকলেও কোন কোন বিষয়ে আল্লাহ অজ্ঞ (নাউজুবিল্লাাহ)। এটা যেমন আল্লাহ সম্পর্কে অযৌক্তিক ধারণা তেমন আল্লাহর দেওয়া ধর্মকে গ্রহণ করার পর জীবনের যে কোন ব্যাপারে আর অন্য কারো নিকটেই কোন কাজের জন্য বিধান চাওয়া যেতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর দেওয়া ধর্মকে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে এবং যত প্রকার সমস্যা মানব-জীবনে সৃষ্টি হতে পারে তার সব সমস্যার সমাধান আল্লাহর দেওয়া ধর্মে থাকতে হবে এটাই যুক্তিযুক্ত।

দেখা যায় আজ পর্যন্ত যত প্রকার ধর্ম পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই দাবী যে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এছাড়া আর অন্য কোন ধর্মই এ দাবী করতে পারেনি যে, তা সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। অর্থাৎ জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক

ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামে পূর্ণাঙ্গ বিধান রয়েছে। ইসলামে রয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের আইন-কানুন যা অন্য কোন ধর্মে নেই।

Ø ধর্মীয় আইন হতে হবে নির্ভুলঃ

দেখা যায় পৃথিবীতে এমন বহু ধর্ম রয়েছে যার ধর্মীয় আইন মানুষকেই সংশোধন করতে হয়। যেমনঃ সতীদাহ প্রথা ছিল একটা ধর্মীয় আইন, যা মানুষের নজরে ভুল আইন হিসেবে ধরা পড়ে। ফলে ইশ্বরের ভুল আইন মানুষকেই সংশোধন করতে হয়। তাই অনেকেই বিভিন্ন ধর্ম থেকে এসে কেন মুসলমান হয়েছে তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেনঃ"অন্যান্য ধর্মের ভুলক্রুটি সংশোধন করে মানুষ আর মানুষের ভুলক্রুটি সংশোধন করে ইসলাম। তাই ইসলামের এই মাহত্ব দেখেই মুসলমান হয়েছি।" এ গৌরব একমাত্র ইসলাম করতে পারে যে এর কোন একটি কথাও অবৈজ্ঞানিক নয়।

Ø ধর্মীয় বিধান পক্ষপাতহীন হতে হবেঃ

সৃষ্টিকর্তা যেমন সবার কাছে সমান তেমনই তাঁর আইনও হতে হবে সবার জন্য সমান। অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর বাণী হিসাবে কুরআনের প্রতি সবার থাকতে হবে সম অধিকার। অবশ্য ইসলামের ক্ষেত্রে তা আছেও। কিন্তু দেখা যায় কোন কোন ধর্মের ব্যাপারে তা নেই। যেমন বেদে শুদ্রদের কোন অধিকার নেই। তাছাড়া ইসলামে যা এবাদত (বন্দেগীর) নিয়ম রয়েছে তা প্রত্যেকের জন্য একই বিধান। অর্থাৎ প্রত্যেককেই একই নিয়মে এবাদত করতে হবে। এখানে কারও জন্যই কিছু মাফ নেই বা কন্সিডার নেই। কিন্তু কোন কোন ধর্মে দেখা যায় উপাসনা সবাইকে করতে হয় না। এমন কি সবার উপাসনার অধিকার পর্যন্ত নেই। যেমন হিন্দু ধর্মে উপাসনার যাবতীয় মন্ত্র পাঠ ও অনুষ্ঠানাদি পালন করে শুধুমাত্র পুরোহিতগণ। আর অন্যান্যরা শুধু সেখানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি করে মাত্র। তাদের কোন মন্ত্র পড়ার প্রয়োজন হয় না।

খ্রীষ্টানদেরও সবাইকে একই নির্দিষ্ট পন্থায় কোন উপাসনা করতে হয় না যেমন করতে হয় মুসলমানদের নামাজ রোজাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে। তা ছাড়া এমন দেখা যায় হিন্দুদের বেলায় এমন শ্রেণীভাগ রয়েছে যা অবশ্যই পক্ষপাতমূলক। যেমনঃ পূজার পৌরহিত্ব করার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই আছে এবং তা আছে জন্মসূত্রে। এতে আর কারও কোন অধিকার নেই, তা সে যতই ধার্মিক হোক না কেন।

শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণদের পূজা অর্চনার যে অধিকার রয়েছে সে অধিকার কেড়ে নেয়ারও অধিকার কারও নেই, তা সে ব্রাহ্মণের পুত্র কাট্টা নাদান কিংবা চারিত্রিক দিক থেকে সর্বজন ধিকৃত হলেও। তা ছাড়াও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের পিতা মাতার মৃত্যুতে যে কয়দিন শোক পালন করতে হয় তার মেয়াদ হচ্ছে ৩০ দিন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের বেলায় পালন করতে হয় মাত্র ১১ দিন। পক্ষান্তরে ইসলামের বিধান মোতাবেক আজই যদি কোন মুচি-মেথরও মুসলমান হয়, তবে ইসলামী বিধান মোতাবেক কালই সে ব্যক্তি একজন আওলাদে রসূলের (নবী পরিবারের সন্তান) সামনে

দাঁড়িয়েও ইমামতি করার অধিকার রাখে। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র ইসলামেই কোন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব নেই। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মে দস্তুরমত পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

খ্রীষ্টানদের বেলায় উপাসনা ধর্ম যাজকদের জন্য। আর অন্যান্যদের জন্যে শুধু যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসই যথেষ্ট, তাতেই নাকি তাদের মুক্তি।

কিন্তু ইসলামের বেলায় সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। এখানে শুধু বিশ্বাসে কোনই ফায়দা নেই। তাকে বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিটি কাজই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবং একমাত্র রসূল (ﷺ)-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে করতে হবে-এতে কারও কোন কন্সিডার (ছাড়) নেই।

Ø পৈতৃক ধর্ম অপেক্ষা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য না হলে কেউ নতুন ধর্ম গ্রহণ করেন নাঃ

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বহু গণ্যমান্য বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এমনকি রাজা-বাদশা ও বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতও ইসলামের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা দেখে

ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে এমন নজীর পাবেন না যে, কোন জানা-শুনা অভিজ্ঞ মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম যেমন খ্রীষ্টান বা হিন্দু ধর্মে দিক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের পুরোহিতরাও যেমন ড: ইসলামুল হক বা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য হিন্দুদের পুরোহিত হয়েও হিন্দু ধর্ম পড়াশুনা করে দেখলেন যে এটা ভুল। পরে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রন্থ পড়ে বুঝলেন এটাও অচল। এরপর ইসলামের ওপর পড়াশুনা করে দেখলেন যে এটাই মহাসত্য ও সঠিক।

অবশেষে ভট্টাচার্য ইসলামই তিনি গ্রহণ করলেন এবং মূল্যবান বহু পুস্তাকাদি লিখে হিন্দু ভাইদেরকে উপহার দিলেন। যেমন: "আমি কেন মুসলমান হলাম?" ও "মূর্তি পূজার গোড়ার কথা" ইত্যাদি। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও কোন ইমাম সাহেব কি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে নতুন ধর্মের উপর কোন বই পুস্তক রচনা করেছেন? গোটা পৃথিবী ঘুরেও কি কেউ এ ধরণের কোন নজীর উপস্থিত করতে পারবেন? তা অবশ্যই কেউ পারবেন না।

Ø ধর্মীয় গুরুগণকে হতে হবে সবার জন্য আদর্শঃ

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এস, সি, পাশ একজন নও মুসলিমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি কি দেখে মুসলমান হলেন? তিনি উত্তরে বলেন, হিন্দুদের যারা পূজনীয় ব্যক্তি তাদের আদর্শ যদি আজ পৃথিবীর সর্বত্র বাস্তবায়ন করা হত, তবে সারা পৃথিবীর অবস্থা আজ কি হত তা চিন্তা করে আমি মুসলমান হয়ে গেছি। তিনি আরো বলেন, আজ যদি দেশের যুবক ছেলেরা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণ ক'রে যুবতি মেয়েদের কাপড় নিয়ে গাছে ওঠে বসে থাকে তাহলে সমাজের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে।

তিনি আরো বলেন, হিন্দু ধর্মের দেবতাদের এমন কিছু কথা রয়েছে যা কলমে লেখা লজ্জাকর তা হিন্দু ভাইয়েরা প্রত্যেকেই মনে মনে বুঝে নিবেন। বিশেষ করে এই বিংশ শতাব্দীতেও শিবের লিংগের পূজার ন্যায় দৃষ্টান্ত রয়েছে এসবও কি ধর্মীয় কাজ হতে পারে? এই সব দেখে শুনে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি চিন্তা করেছি যে, কোথায় হিন্দুদের

ভগবানের লীলা আর কোথায় মুসলমানদের নবী-রসূলগণের আদর্শ চরিত্র। এসব চিন্তা ভাবনা করে আমি আর হিন্দু থাকতে পারি না। এ ধরণের আর অনেক কিছুই তিনি বলেন।

Ø ধর্মের দৃষ্টিতে সাধু ব্যক্তিঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যিকারে সাধু বা পুণ্যবান ব্যক্তি হচ্ছেন আদর্শবান শিক্ষিত আলেমগণ যাদের কেহই অশিক্ষিত নন। তাঁদের চরিত্রে কোন প্রকার খুঁত নেই এবং তাঁরা সংসার ত্যাগীও নন।

কিন্তু হিন্দু ধর্ম মতে যারা সাধু তাদেরকে দেখা যায় অশিক্ষিত, গেরুয়া বসন পরিহিত, চিমটাধারী, সংসার ত্যাগী, শ্মশানে বসবাসকারী। যাদের সংগে কিছু বিধবা নারী কদুর বস হাতে নিয়ে ঘোরা ফেরা করে শ্মশানে একত্রে বসবাস করে।

আর কোলকতার কালিঘাট মন্দিরের সামনে দেখা যায় কিছু লোক মাথায় মেয়েদের ন্যায় লম্বা চুল রাখে আর সমস্ত শরীরে ছাই মেখে উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকে। তাদেরকে বলা হয় নেংটা সাধু। আর

বিদেশীদের নিকট ‘পায়াস’ ও ‘অনেষ্ট ম্যান’ (ধর্মভীরু) বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় তাদেরকেই।

ইসলামের কিছু বৈশিষ্ট্য

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য এক বৈশিষ্টময় যুগপোযোগী ধর্ম। ইসলাম বিশেষ করে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য। যেমনঃ এবাদত (উপাসনা), লেনদেন, বৈষয়িক, আত্মিক, তাহযীব, তামাদ্দুন, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈকিত, রাজনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ব্যাপারে বিস্তারিত নীতিমালা প্রদান করেছে।

আল্লাহর তাওহীদ তথা একাত্ববাদের বিস্তারিত আলোচনা এবং তা বাস্তবায়ন করা। শির্কের মূলোৎপাটনের মাধ্যমে ব্যক্তি গঠন ক'রে তাওহিদী সমাজ গড়া। রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাই ইসলাম ধর্মের কর্মসূচী।

নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামের কিছু ধারা-নীতি, অধিকার ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলোঃ

প্রথমত: কিছু মূল নীতি:

১. তাওহীদ ও শিরকের বিস্তারিত নীতিমালা।
২. এবাদত তথা উপাসনার বিস্তারিত বর্ণনা।
৩. লেনদেন তথা আদান প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারিত আলোচনা।
৪. বিবাহ ও সন্তানদের প্রতিপালনের নীতিমালা।
৫. উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের বিস্তারিত বণ্টন বিধিবিধান।
৬. অপরাধ ও বিপর্যয়ের শাস্তির বিধান। যেমন: হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মদ পান, সতী-সাধ্বী নারীকে অপবাদ, দ্বীন ত্যাগ, বিপর্যয় সৃষ্টি ইত্যাদির বিস্তারিত শাস্তি ও প্রয়োগের নীতিমালা।
৭. ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক নীতিমালা।
৮. রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির বিস্তারিত ধারানীতি।
৯. সমরনীতি, যুদ্ধ বন্দী বিনিময় ও চুক্তির বিস্তারিত আইন প্রয়োগ।
১০. আইন ও বিচার বিষয়ক নীতিমালা।
১১. বিবিধ।

দ্বিতীয়তঃ মৌলিক কিছু অধিকারঃ

১. আল্লাহর নেতি বাচক অধিকার তথা শির্ক উৎখাত এবং ইতি বাচক অধিকার তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা।
২. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নেতি বাচক অধিকার তথা বেদাত থেকে দূরে থাকা এবং ইতি বাচক অধিকার তথা একমাত্র তাঁর বিশুদ্ধ সুন্নত মোতাবেক সকল আমল করা।
৩. পিতা-মাতার অধিকার।
৪. স্বামী-স্ত্রীর আপোসের অধিকার।
৫. সন্তান-সন্ততির অধিকার।
৬. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার।
৭. প্রতিবেশীর অধিকার।
৮. সাধারণ মুসলমানদের অধিকার।
৯. রাজা-প্রজা ও দায়িত্বশীল ও তাদের অধীনস্তদের অধিকার।
১০. অমুসলিমদের অধিকার। অমুসলিগণ চার প্রকার। (এক) চুক্তিবদ্ধ (দুই) নিরাপত্তাধারী তথা পাসপোর্টের মাধ্যমে ভিসাধারী (তিন) জিম্মি তথা

মুসলিম রাজ্যে কর প্রদানকারী (চার) যুদ্ধরত অমুসলিম। শেষের প্রকার ছাড়া অন্য তিনি প্রকারের জন্য সর্বপ্রকার অধিকার ইসলাম প্রদান করেছে।

১১. পশু-পাখী ও জীবজন্তুর অধিকার।

তৃতীয়তঃ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই যার মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলো স্থান পয়েছে।

১. সর্বক্ষেত্রে বিবেক ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন।
২. সকল নবী-রসূল ও আসমানী সমস্ত গ্রন্থাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।
৩. সকল সমস্যার সমাধান।
৪. সর্ব কালের ও সকল জাতি এবং স্থানের জন্য উপযোগী।
৫. মধ্যম পন্থা অবলম্বন যাতে নেই কোন বাড়াবাড়ি আর না রয়েছে শিথিলতা।
৬. স্বীয় ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থকে (কুরআন) পরিবর্ধন ও পরিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ব সংরক্ষণ।

৭. ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য উপযুক্ত।
৮. সর্বপ্রকার কল্যাণকর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাথে ঐক্যমত পোষণ।
৯. ইসলামই একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার ধর্ম যা বাস্তবতা ও ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত।
১০. সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য পার্থিব্য বিধান একই।
১১. যার মধ্যে কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ও একনায়কত্বের কোন অবকাশ নেই বরং সবকিছুই পরামর্শের ভিত্তিতে হতে হয়।
১২. চরম শত্রুর সাথেও ন্যায় পরায়ণতার পন্থা অবলম্বন করা।
১৩. নারীদের জন্য সর্বস্তরে অধিকার প্রতিষ্ঠা।
১৪. সর্বপ্রকার শ্রেণীবিভাগ তথা কালো-সাদা এবং আরব-অনারব কিংবা ধনী-গরিবের মধ্যের সর্বপ্রকার ভেদাভেদ দূর করে সাম্য ও ঐক্যের আহ্বান।
১৫. কল্যাণকর জ্ঞানার্জনকে অপরিহার্য এবং উহা গোপন করা হারাম।

১৬. এর কোন বিধান আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

১৭. ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের জন্য একটা অংশ জাকাত নির্ধারণ, যাতে করে উভয়ের মাঝে সেতু বন্ধন সৃষ্টি হয়।

১৮. সকল সৃষ্টিজীব ও প্রাণীর প্রতি দয়া করার জন্য নির্দেশ।

১৯. মানুষের সম্পদ ও স্বাস্থ্যের সংরক্ষণের প্রতি জরুরিভাবে গুরুত্ব আরোপ।

২০. সর্বপ্রকার ধোঁকাবাজি, কালো বাজারী, মিথ্যা, সুদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, জুলুম, নোংরাপনা, অশ্লীলতা, চুরি-ডাকাতি, হানাহানি, মারামারি, ছিনতাই-রাহাজানি হারাম। এক কথায় মানব জীবনের জন্য যাকিছু অকল্যাণকর তার সবই ইসলামে গর্হিত ও নিষিদ্ধ।

২১. সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার অপনোদন।

আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

একদিকে যেমন ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মই একখানা পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ দিতে পারে না। তেমন কুরআনে এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা নাজিল হয়েছে ১৪শত বছর পূর্বে আর সত্যতার প্রমাণ হচ্ছে আজ এই একাবিংশ শতাব্দিতে। এই কুরআনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই। যেমনঃ

(১) কুরআনের ভাব–ভাষা এমনভাবে সুবিন্যস্ত যার অনুরূপ একটি সূরা আজ পর্যন্ত কেউ তৈরী করতে পারেনি।

(২) যার উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি বা কোন কথাকেও আজ পর্যন্ত কেউ অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করতে পারেনি।

(৩) পৃথিবীর সব ধর্মের ধর্মগ্রন্থ যদি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে নতুন করে হাফেজদের মাধ্যমে কুরআন পুনরাবৃত্ত করা সম্ভব। এছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থই পুনরাবৃত্ত করা সম্ভব নয়।

(৪) সু-সাহিত্যিক আবু-উসমান আল জাহিশ বলেন, কুরআন নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ, আস্তিকদের জন্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা, হালালের প্রতিষ্ঠাতা, হারামের উচ্ছেদকারী এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। কুরআন এমন বিচারক যে, জ্ঞানী মূর্খ সবাই যার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এমন জ্ঞান যার ধ্বংস নেই। এমন মুর্শিদ (পথ প্রদর্শক) যে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে থাকে।

(৫) মিঃ ভুগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেনঃ কুরআন একটি চিরন্তন আদর্শ। দীর্ঘ তেরশো বছর পরও কুরআনী শিক্ষার প্রভাব এত বেশি শক্তিশালী যে, নীচ বংশের একজন নগণ্য লোকও ইসলাম গ্রহণ করার পর বড় বড় খান্দানী মুসলমানের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

(৬) জি, এম, রাডউইন তাঁর 'দি কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেনঃ আল কুরআন জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার উৎস। এ কথা মানতেই হবে যে, আল্লাহর একত্ববাদ, শক্তি, জ্ঞান এবং সত্যতার যে বর্ণনা

আমরা কুরআনে পাই তা অন্য কোথাও পাই না। এ ছাড়া বেহেশত, দোযখ, আকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কে অনবদ্য (নিখুঁত) ও সুস্পষ্ট আলোচনার জন্য আমরা কুরআনের যে প্রশংসা করি তা খুবই সামান্য এবং অসম্পূর্ণ।

(৭) গালমার বলেনঃ শ্রেষ্ঠ আরব লেখকের কুরআনসম উৎকর্ষ কোন গ্রন্থ রচনায় কৃতকার্য হতে না পারা বিস্ময়কর নয়।

(৮) ঐতিহাসিক লেনপুল বলেনঃ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুনিয়ার উপর পাপাচারের যে সব আচ্ছাদন পড়েছিল পবিত্র কুরআন সেসব নির্মূল করলো। পবিত্র কুরআন দুনিয়াকে উন্নত চরিত্র, নাগরিক আইন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করলো।

(৯) De-La-Vininetto গ্রন্থে বলেনঃ মুহাম্মদ (ﷺ) ছিলেন ধর্মীয় গুরু এবং সমাজ সংস্কারক। আর আল-কুরআন হলো ধর্মীয় ও আইন গ্রন্থ। ইসলাম হলো বর্তমান বিশ্বের ডায়নামিক ধর্ম যা বিশ্বের সকল ধর্মের উপর জয়ী হচ্ছে।

(১০) ডঃ মরিস বুকাইল বলেনঃ বিষয় বস্তুর পরিপাট্য এবং ভাবের গাম্ভির্যে পবিত্র কুরআন সমস্ত আসমানী কিতাবকে ছাড়িয়ে গেছে। অনন্ত প্রভু তাঁর আসমানী অনুগ্রহে মানুষের জন্যে যে সব গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, পবিত্র কুরআন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের সুর গ্রীক দর্শনের সুর হতে অনেক ঊর্ধ্বে। কুরআনের এরূপ তথ্য-রহস্য কোন দিনই সেকেলে হবার নয়।

(১১) তিনি আরো বলেনঃ কুরআন সুসঙ্গত ভাবেই বলা যায়, বিজ্ঞানীদের জন্যে একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্যে একটি শব্দকোষ, বৈকারণিকদের জন্য একখানা ব্যাকরণ গ্রন্থ, কবিদের জন্যে একখানা ছন্দ, সংহিতা এবং কানুন ও বিধানের জন্য বিশ্বকোষ। বাস্তবিক কুরআনের পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থই কুরআনের সাথে সমতুল্য নয়।

(১২) J. E. Swaon The histori of world civilization বলেনঃ কুরআন হলো মুসলমানদের

ধর্মের সনদ ও শাসনতন্ত্র যা ইহজগতের মানুষের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে এবং পরলোকে তাদের মুক্তির নিশ্চয়তা দান করে।

(১৩) ফরাসী দার্শনিক লিভার জোর বলেনঃ আল-কুরআন উজ্জ্বল ও বিজ্ঞানময় এক অসাধারণ গ্রন্থ। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। কেননা, এটা এমন এক ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি সত্য নবী এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

(১৪) ডেভিন রপোর্ট 'মুহামাদ এন্ড কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেনঃ আল-কুরআন মুসলিম জাতির সামগ্রিক জীবন বিধান। পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, বিচার ও প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে উপযোগী, উন্নত, সার্বজনীন ও কল্যাণকর বিধানাবলী এতে বিদ্যমান। পাশাপাশি এটি একটি ধর্মীয় গ্রন্থও বটে।

(১৫) ড. স্যামুয়েল জনস বলেনঃ আল-কুরআনের মর্ম ও আবেদন এতই ব্যাপক, সার্বজনীন ও কালজয়ী যে, প্রতি যুগের যাবতীয় স্লোগান

অবলীলায় এর সামনে অনুজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আর বিজন বন, প্রাণহীন মরু, সুসভ্য নগর এবং বিশাল সাম্রাজ্য সর্বত্রই এর আওয়াজ সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষিত হয়।

(১৬) ফরাসী গবেষক মসিয়ে লুমিয়র বলেছেন: যারা ইসলামকে বর্বর ধর্ম বলে থাকে তারা কুরআন মজীদের শিক্ষা ও দর্শন সম্পর্কে অজ্ঞ। কুরআনের শিক্ষার আলোকেই বর্বর আরবদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। তারা একেকটি সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল।

(১৭) খ্যাতিমান বাঙ্গালী সাহিত্যিক বাবুচন্দ্র পাল লিখেছেন: আল-কুরআন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পতাকাবাহী। কুরআনের শিক্ষায় হিন্দুদের মত জাতপাতের ব্যবধান নেই। যেখানে কাউকে শুধু কুলীন বা উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

(১৮) ভারতীয় গবেষক লালা লাজপত রায় বলেছেন: আল-কুরআন আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শিক্ষক। আমি ইসলামকে ভালবাসি

এবং ইসলামের নবীকে মহাপুরুষ বলে জানি। আমি আন্তরিকভাবে কুরআনের চারিত্রিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আচরণগত এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রসংশা করি। ইসলামের শিক্ষার প্রসংশা করি এবং ইসলামের ঐ নৈতিক বৈশিষ্টকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি, যা উমর ইবনে খাত্তাব (রা:)-এর যুগে ছিল।

(১৯) 'বোনাপার্ট এণ্ড ইসলাম' গ্রন্থ থেকে নেপোলিয়নের উক্তি: আল-কুরআন অদ্বিতীয় জীবন বিধান। আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি পৃথিবীর সকল জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও প্রতিভাধর ব্যক্তিদেরকে একত্র করে কুরআনী শিক্ষার আলোকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করব। শুধুমাত্র এই শিক্ষাই মানব জাতিকে সন্তোষজনক ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

(২০) কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন: আল-কুরআন মানব জগতের সংস্কারক, আধ্যাত্মিক নির্দেশনা এবং জ্ঞানগর্ভ তথ্যে সমৃদ্ধ এক মহাগ্রন্থ, যা মানব সভ্যতায় এক বিস্মকর সংস্কার সাধন করেছে। যে

সকল মনীষী এর মর্ম এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সন্ধান পয়েছেন তাঁরাই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। মানব জীবনের যে কোন সমস্যার কাছে নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, কুরআন তার সমাধান বের করবেই।

(২১) মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'ইয়াং ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লেখেন: আল-কুরআন একটি ঐশী গ্রন্থ। আমি আল-কুরআনের শিক্ষা ও দর্শনের উপর পড়াশোনা করেছি। এক ঐশীগ্রন্থ বলে গ্রহণ করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আমার কাছে এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে এদিকটাকেই বেশি প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানব প্রকৃতির সঙ্গে এর বিধানাবলীর আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়।

(২২) তিনি আরো বলেন: কয়েকবার গভীর মনোযোগের সাথে আমি কুরআন অধ্যায়ন করেছি, সততা ও পথ প্রদর্শনের শিক্ষা সেখানে দেখে আমি অত্যান্ত মুগ্ধ এবং মোহিত হয়েছি।

(২৩) খৃষ্টান ঐতিহাসিক মিঃ বাগলে বলেনঃ আল-কুরআন বিতর্কের উর্ধ্বে এটাই একমাত্র গ্রন্থ, যার মধ্যে তেরশো বছরেও কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংঘটিত হয়নি। আল-কুরঅনের সামনে উপস্থাপন করার মত কোন জ্ঞান ইহুদি এবং খ্রীষ্টান ধর্মে নেই।

(২৪) টমাস কারলাইল লিখেছেনঃ আমার নিকট এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার যে, কুরআনের মধ্যে সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতার গুণাবলী সর্বযুগেই সমভাবে বিদ্যমান। আর এ কথাটি দিবালোকের মত সত্য যে, পৃথিবীতে যদি সুন্দর এবং কল্যাণকর কিছু সৃষ্টি হয়, তবে তা কুরআন থেকেই হতে পারে।

এসব আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল-কুরআন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় গ্রন্থ। এর শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব অনস্বীকার্য, দলমত নির্বিশেষে যেই এর অধ্যায়ন করেছে সেই এর চমৎকারিত্বে বিমোহিত হয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, এরচেয়ে সুন্দর গ্রন্থ আর নেই। এটি শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থই নয় বরং মানব

জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্দেশনা প্রদানকারী এক মহামূল্যবান গ্রন্থ।

আশা করি পৃথিবীর মানুষ যতই এর উপর চিন্তা-ভাবনা করবে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝার চেষ্টা করবে, ততই মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এ ছাড়া এই বিজ্ঞান ও দর্শনের চরম উন্নতির যুগে কেউ আর অন্ধকারে থাকবে না বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

পরকাল যে সত্যিই হবে তার প্রমাণ

১নং যুক্তি:

মানুষ পরকাল সম্পর্কে সাধারণত: দু'টি কারণে মিথ্যা বলে। যথা:

১. কোন না কোন লোভ বা স্বার্থের বশীভূত হয়ে।
২. কোন না কোন ভয়ের কারণে।
ফলত: এ দু'টি জিনিস যখন কারও সামনে থাকে না তখন সে সত্য কথাই বলে এটাই মানব প্রবৃত্তি।

আমরা দেখি দুনিয়ার নবী-রসূলগণ (عليهم السلام) সবাই বলেছেন পরকাল হবে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই এমন ছিলেন যে, কোন প্রকার লোভ বা ভয় তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। কাজেই তাঁরা যখন সবাই একই কথা বলেছেন তখন অবশ্যই তা মিথ্যা হতে পারে না।

২নং যুক্তি:

যা সত্য সাক্ষ্য তা যত মানুষই সাক্ষ্য দিক না কেন প্রত্যেকের কথা একই প্রকার হয়। আর যা মিথ্যা

সাক্ষ্য তা কখনও একটার সাথে অন্যটার মিল হয় না। যেমন: একই অংকের সঠিক উত্তর প্রত্যেকটির একই প্রকার হয়। কিন্তু ভুল উত্তর কখনও একটার সাথে অন্যটার মিল হয় না। এই যুক্তি মোতাবেক দেখা যায় যে, আল্লাহর প্রত্যেক নবী আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত এবং পরকাল সম্পর্কে হুবহু একই কথা বলেছেন। যদিও তাঁরা বহু যুগ বা শতাব্দির ব্যবধানে পৃথিবীতে এসেছেন। কারও সাথে কারো দেখা হয়নি অথচ তাঁরা একই কথা বলেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ কথা মিথ্যা হলে সবার কথা একই প্রকার হতে পারতো না।

স্মরণ রাখতে হবে যে, মানব মনের একটা মৌলিক দাবী হচ্ছে: ভাল কাজের জন্য ভাল ফল এবং মন্দ কাজের জন্য মন্দ ফল পাওয়া। তা অবশ্যই আল্লাহ পূরণ করবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ দাবি পূরণ হচ্ছে না। আর দেখা যাচ্ছে যে, মানব মনের আর একটা দাবি পূরণ হচ্ছে না সেটা হলো পাপ পুণ্যের পরিমাপযন্ত্র। অর্থাৎ এমন একটা যন্ত্র আবিস্কার হলে ভাল হত, যে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ বলে দিতে পারত

কে কতটুকু পাপী আর কে কতটুকু পুণ্যবান। অর্থাৎ কার কি পরিমাণ শাস্তি হওয়া উচিত, আর কার কি পরিমাণ পুরস্কার পাওয়া উচিত। কিন্তু এ ধরণের কোন যন্ত্র এখনও আবিস্কার হচ্ছে না। কেন তা হচ্ছে না? এর কারণ হলো আল্লাহর বিধান।

আর তা হচ্ছে সবকিছু পাওয়ার জন্য একটা উপযুক্ত সময় আসতে হবে। যেমন: দাঁতের বয়স না হলে দাঁত উঠে না। ঠিক তেমনি পাপ-পুণ্যের পরিমাপ যন্ত্র তখনই পাওয়ার কথা যখন পাপ আর পুণ্য নতুন করে হতে পারবে না।

আর যতদিন পর্যন্ত পাপ আর পুণ্য হতেই থাকবে ততদিন পর্যন্ত সঠিক মাপ আসতে পারবে না। তাই যেদিন পাপ-পুণ্য খাতায় জমা হবে না বা আমল নামায় লেখা বন্ধ হয়ে যাবে সেদিনই পরিমাপ যন্ত্র (মিজান) আল্লাহ হাজির করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আমরা হয়ত মনে করতে পারি যে, যে লোকটা মরে গেছে তার তো পাপ-পুণ্য বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে তা হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾

‘‘নাহ্নু নুহ্য়িলমাওতাা ওয়ানাকতুবু মাা ক্বদ্দামূ ওয়া আছাারহুম’’

“আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তসমূহ লিপিবদ্ধ করি।” [সূরা ইয়াসিন:১২]

অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি কোন ভাল কাজ করে তবে মরে গেলেও তার সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয় যেটাকে বলা হয় ‘সদকায়ে জারিয়া’ (প্রবাহমান দান)। আর বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি পাপের কাজ জারি করে যায়। যেমন ধরুন: একটা সিনেমার হল তৈরী করে গেল-তার মৃত্যুর পর ঐ সিনেমা হলে যত পাপের কাজ হতে থাকবে তার সমতুল্য পাপ ঐ হলের প্রতিষ্ঠাতার নামে জমা হতে থাকবে। আর এটা বন্ধ হবে তখনই যখন পৃথিবী ফানা বা কিয়ামত হয়ে যাবে। তখন কোন মসজিদও থাকবে না পুণ্যের জন্য আর না কোন সিনেমা হলও থাকবে পাপের জন্য। সবই বিলীন হয়ে যাবে।

এরপর ঐ দু'টি চাহিদা পূরণের জন্যে ভিন্ন পদ্ধতির এক নতুন জগৎ সৃষ্টি হবে। যেখানকার জীবন হবে চিরস্থায়ী জীবন। যে জীবনের শাস্তি ও পুরস্কার ভোগ করার মত উপযুক্ত সময় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ হিরোসিমা ও নাগাসিকার উপর বোমা ফেলে যে লোকটি এক মুহূর্তের মধ্যে কত হাজার হাজার মানব সন্তানকে মেরে ফেলল তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হলে তাকে হাজার হাজার বার মারা দরকার।

কিন্তু এই পৃথিবীর জীবনে যেখানে একটা মানুষকে মাত্র একবারই মেরে ফেলা যায়, সেখানে একাধিক ব্যক্তির হত্যাকারীকে উচিত শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মানব মনের দাবী হচ্ছে এই যে, এমন একটা চীরস্থায়ী জীবন দিতে হবে যেখানে একাধিক ব্যক্তির হত্যাকারীকে একাধিকবার হত্যা করা যায়। এ ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে যারা এ পৃথিবীর উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের ভাল করতে গিয়ে চরম জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন তাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যায়। আর সে পুরস্কার ভোগ করার মত একটা দীর্ঘ সময়ও তাকে দেওয়া যায়। মানুষের মনের এই

মৌলিক দাবি পূরণ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবেন এবং ন্যায় বিচার করবেন। আর যদি আল্লাহ তা'য়ালা নাই দেন তবে ন্যায় বিচারক হিসাবে গণ্য হতে পারেন না

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, পরকাল হতে হবে মানুষের প্রয়োজনেই। কাজেই তা আল্লাহ তা'য়ালা দিতে ওয়াদা করেছেন যেন তিনি ন্যায় বিচার করতে পারেন এবং তা কার্যকর করতে পারেন।

হিন্দু ভাইদের প্রতি একটি নিবেদন

আদম সন্তান হিসাবে আমরা আপনাদের ভাই। আর ভাই হিসেবেই একটা কথা গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করতে অনুরোধ করছি।

চিন্তা করুন, ধর্মের সম্পর্ক হলো বিশ্বাসের সঙ্গে। আর আমরা পূর্বেও বলেছি বিশ্বাসের সম্পর্ক রক্তের সঙ্গে নয়, এর সম্পর্ক হচ্ছে জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে।

ক. চিন্তা করুন, আপনার ধর্ম গ্রন্থ বলেঃ বৃহস্পতির স্ত্রী তারার আপত্তি সত্ত্বেও তার সাথে ব্যভিচার করার কারণে চন্দ্রকে তারা অভিশাপ দেয়। আর এই অভিশাপের কারণে চাঁদ মাঝে মাঝে রাহুগ্রস্ত হয়, যার ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন?

খ. চিন্তা করুন, যে মন্ত্রে পাপ খণ্ডন হয় সে-মন্ত্র হচ্ছেঃ অহল্যা দ্রৌপদি কুন্তি মন্দোদরী যথা-পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম। অর্থাৎ অহল্যা, দ্রৌপদি, কুন্তি, তারা এবং মন্দোরী এই পাঁচ কন্যার নাম প্রত্যহ স্মরণ করলে মহাপাপও

মাফ হয়ে যায়। যাদের প্রত্যেকের যৌন জীবন সম্পর্কে আপনাদের জানা আছে। তাদের স্মরণে যে ধর্মের পাপ মাফ হয়ে যায় সে ধর্ম কি ধর্ম ও আজকের সভ্য যুগে চলতে পারে?

গ. এই ধরণের আরও বহু প্রশ্নকে সামনে রেখে আপনি চিন্তা করুন হিন্দুধর্ম কি আসলে ইহকাল ও পরপাকালের মুক্তির কোন পথ দেখাতে পারে?

দেখুন, আপনি যখন বলেছেন যে, আমি একজন হিন্দু, তখন ঐসব চরিত্রহীনাদের সঙ্গে হয়ে পড়ছে আপনার ধর্মীয় সম্পর্ক। আর যখনই বিশ্বাস শুদ্ধ করে নিয়ে আপনি বলছেন, আমি একজন মুসলমান' তখনই আপনার সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস এবং নবী-রসূলগণের সঙ্গে।

সমাপ্ত